بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা ইব্রাহীম

ابراهيم

সূরা: 14 | নাযিলের ধরণ: মক্কী | আয়াত: 52

সূরা ইব্রাহীম ১৪৫২ আয়াত, ৭ রুকু, মক্কী,
(পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহর নামে)

ভূমিকাঃ সুরা নং ১০ থেকে ১৫ পর্যন্ত সুরাগুলিতে ধারাবাহিকাতার যে ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে এবং তার পক্ষে যে, যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে সে জন্য দেখুন সুরা ১০ এর ভূমিকা।

এই সুরার বিশেষত্ব হচেছ : এই সুরাটি পূর্বাক্ত (সুরা রাদ) সুরাটির শেষ অংশ বিশেষ হিসেবে ধরা যায়। এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কি ভাবে স্বার্থান্ধ লোকের স্বার্থপরতা সত্বেও, সত্য তার নিজস্ব শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সত্যকে উপস্থাপন করার জন্য হযরত মুসা ও হযরত ইব্রাহিমের জীবন কাহিনীকে উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এই সুরার মর্মার্থ হচেছ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রার্থনা।

সার-সংক্ষেপ : আল্লাহর প্রত্যদেশ মানুষের আত্মার অন্ধকার দূর করে সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত করে। এই প্রত্যাদেশ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাদের নিজস্ব ভাষাতে প্রদান করা হয়েছে। আর তা করা হয়েছে তাদের যুগ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের পটভুমিতে । এ কথা হযরত মুসার সময়ে যেমন প্রযোজ্য অন্যান্য রাসুলদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য । সর্ব যুগে সর্ব সময়ে দেখা যায়, ভালো ও মন্দের মধ্যে, সত্য ও অসত্যের মধ্যে , ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন্দের ধ্বংস অনিবার্য হযে দাড়ায়। সত্যকে এখানে বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে যার শিকড় বহুদূরে পর্যন্ত সুদূরভাবে বিস্তৃত । [১৪:১-২৭]

কেন সাধারণ লোক আল্লাহর করুণা গ্রহণ করতে চায় না? কেন তারা ভ্রান্ত পথে চলার জন্য অধিক আগ্রহী ? নাস্তিকতার মনোভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হযরত ইব্রাহীম তাঁর নিজের জন্য ও তাঁর সন্তানের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন। তিনি আরও প্রার্থনা করেন মক্কা নগরীর জন্য, যে নগরীতে আল্লাহর ভবিষ্যত প্রত্যাদেশ প্রেরিত হবে। ভাল এবং মন্দ স্ব স্ব কাজের প্রতিদান পাবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর একত্ববাদ সর্বত্র বিরাজ করবে। [১৪:২৮-৫২]

সূরা ইব্রাহীম ১৪৫২ আয়াত, ৭ রুকু, মক্কী,

(পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহর নামে)

১। আলিফ -লাম- রা। এই কিতাব আমি তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি মানব জাতিকে অন্ধকারের অতল থেকে আলোতে পরিচালিত করতে পার তাদের প্রভুর নির্দ্দেশক্রমে ১৮৭০, [তার] পথে যিনি মহাশক্তিধর, সকল প্রশংসার যোগ্য ১৮৭১।

১৮৭০: এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, রসুলগণ আল্লাহ্র হুকুম প্রচার করেন। তাঁরা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু করেন না । তাঁদের প্রচারিত বাণী "প্রতিপালকের নির্দ্দেশক্রমে" হয়ে থাকে। সৃষ্টির আদিতে মানুষের আত্মা থাকে পূত পবিত্র। পৃথিবীর যাত্রা পথে, পাপের পঙ্কিলময় পথ অতিক্রমকালে, আত্মা তার নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। পাপের অন্ধকার আত্মার উপরে যবনিকা টেনে দেয়। সেই দুভের্দ্দ অন্ধকারের পর্দ্দাকে অপসারণ করা সম্ভব একমাত্র আল্লাহ্র করুণার দ্বারা। আত্মার অন্ধকারকে অপসারণ করে হেদায়েতের আলোতে আনার ক্ষমতা কারও নাই - যিনি প্রচার করেন তারও নাই, যারা তা শ্রবণ করে তাদেরও নাই। ব্যক্তির আন্তরিক চাওয়ার প্রেক্ষিতে, আল্লাহ্ তাঁর হেদায়েত ও করুণা দান করেন। এখানে অন্ধকার হচ্ছে পাপের পথ ও আলো হচ্ছে পূণ্য পথের প্রতীক । মানুষের কর্ম দ্বারাই আল্লাহ্র হুকুম নিয়ন্ত্রিত হয় ।

১৮৭১: পরবর্তী আয়াতে এই আয়তটির বক্তব্য শেষ করা হয়েছে। এই আয়াত দুটিতে আল্লাহর তিনটি রূপকে বা গুণকে তুলে ধরা হয়েছে। (১) আল্লাহ মাহমান্বিত, ও সমস্ত সৃষ্টির উপরে পরাক্রমশালী (২) তাঁর করুণা দয়ার জন্য তিনিই একমাত্র প্রশংসার পাত্র। (৩) আকাশ মন্ডলী পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর কর্তৃত্ব তাঁরই। মানুষের এবাদত বা প্রশংসা তার কোন প্রয়োজন নাই। বরং মানব সন্তান আল্লাহর এবাদত করে তার নিজস্ব প্রয়োজনে। আল্লাহর করুণা দয়া, সৃষ্টির সকলের জন্য সমভাবে বহমান। সৃষ্টির সব কিছু তারই কর্তৃত্বাধীন সুতরাং বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে তারই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হবে।

২। আল্লাহ - আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তারই অধিকারভুক্ত। কিন্তু হায়! অবিশ্বাসীদের জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি [তাদের অবিশ্বাসের জন্য] ১৮৭২।

১৮৭২: উপরের টিকা দেখুন। আল্লাহর কর্তৃত্ব, পরাক্রম, দয়া, করুণা এসব যারা অনুধাবণে ব্যর্থ তারাই আল্লাহকে অবিশ্বাস করে। প্রতিটি কাজেরই প্রতিফল থাকে। তাদের বিশ্বাসহীনতার দরুণ

তারা তাদের নিজেদের আত্মার উপরে অত্যাচার করে এবং আল্লাহর ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়। বিশ্বাসহীনতা আত্মার মাঝে নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়।

> ৩। যারা পরকাল অপেক্ষা ইহকালের জীবনকে বেশী ভালবাসে ১৮৭৩, যারা [মানুষকে] আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে এবং [আল্লাহর পথে] বক্রতা অনুসন্ধান করে, তাদের পথভ্রান্তি সুদূরে প্রসারিত।

১৮৭৩: অবিশ্বাসী বা কাফেরদের বিশেষত্ব এখানে তিনটি ধাপে তুলে ধরা হয়েছে। (১) তারা ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনকে অত্যন্ত ভালোবাসে, তাদের বিশেষত্ব তারা পৃথিবীর জীবনে দম্ভ, অহংকার চাকচিক্যকে পরকালের জীবনের উপরে স্থান দেয়। (২) তাদের জীবনযাত্রা শুধু যে তাদের ক্ষতি করে তাই ই নয়; বরং তারা তাদের চারিপাশের অন্যান্যদের তাদের ভ্রান্ত পথে আকর্ষণ করে এবং তাদের বিপথে চালিত করে। (৩) তাদের হৃদয় অশুভ চিন্তায় পরিপূর্ণ থাকে ফলে, তারা আল্লাহার দেখানো সরল পথকে বক্রভাবে দেখে। [দেখুন ৭:৪৫] কারণ তারা সব কিছুতে তাদের নিজেস্ব চিন্তার প্রতিফলন দেখে । এ সবের ফলে তারা ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে সত্য পথের থেকে দূরে সরে যায়।

> ৪। স্ব-জাতির ভাষাতে শিক্ষাদান করা ব্যতীত আমি কোন রাসুল প্রেরণ করি নাই, ১৮৭৪ [তারা] যেন লোকদের নিকট [বিষয়বস্তু] পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। এখন, আল্লাহ যাকে ইচেছ ভ্রান্তিপথে ছেড়ে দেন এবং যাকে ইচেছ সৎপথে পরিচালিত করেন ১৮৭৫। তিনি ক্ষমতায় শক্তিধর। প্রজ্ঞাতে পরিপূর্ণ।

১৮৭৪: আল্লাহর প্রত্যাদেশকে প্রচারের উদ্দেশ্য যদি হয় তার অর্থকে সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করা ; তবে, যে জাতির মধ্যে তা প্রথম প্রচার করা হচেছ তাদের ভাষাতেই তা প্রচার করতে হবে, কারণ মাতৃভাষার আবেদন মানুষের হৃদয় তন্ত্রীকে আঘাত হানতে সক্ষম। মাতৃভাষার আবেদন সর্বাপেক্ষা বেশী। আর এ কারণেই আল্লাহর প্রত্যাদেশ বিভিন্ন রাসুলদের নিকট তাদের মাতৃভাষাতে প্রেরণ করা হয়। যেনো তিনি তাঁর স্বগোত্রের নিকট মাতৃভাষাতে তা প্রচার করতে পারেন। আর এভাবেই তাদের মাধ্যমে প্রচার এবং প্রসার লাভ করবে। এবং তা একদিন বিশ্বমানবের মাঝে বিস্তৃতি লাভ করবে। এখানে ভাষা শব্দটি ব্যপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষা শব্দটি শুধুমাত্র বর্ণমালা বা শব্দ বা কোনও বিশেষ ভাষাকে বুঝানো হয় নাই। সৃষ্টির আদি থেকে পৃথিবীতে যুগে যুগে মানুষ মনের ভাবকে, চিন্তাধারাকে প্রকাশের জন্য বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেছে। হাজার হাজার বছর আগে মিশরবাসীরা জীব জন্তুর ছবির মাধ্যমে মনের

ভাবকে প্রকাশ করতো যার ইহকালের নামকরণ করা হয়েছে "হাইরালোগ্রাফী"। এভাবেই সময়ের পরিক্রমায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব ঘটে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, ভাষার উদ্ভব হয়েছে মানুষের মনের ভাব ও চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে। সে কারণেই পৃথিবী যত সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচেছ মানুষের মনের জগত, চিন্তার জগত যত সমৃদ্ধ হচেছ ভাষাও তত রুপান্তরিত হয়ে সমৃদ্ধ লাভ করছে। মানুষের মনোজগতের সাংকেতিক প্রকাশ ভঙ্গীই হচেছ ভাষা। এই সাংকেতিক প্রকাশ কোনটার নাম আরবী ভাষা কোনটার নাম বাংলা, আবার কোনটার নাম ইংরেজী। এভাবে পৃথিবীতে বহু ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর বাণী যেহেতু বিশ্ব মানবের মঙ্গলের জন্য প্রেরিত, সুতরাং এর প্রকাশ যে কোনও ভাষাতেই হতে পারে। সে কারণেই হযরত মুসা বা হযরত ঈসার প্রচারের ভাষা আরবী ছিলো না। আল্লাহর বাণীর প্রকাশ যে কোনও ভাষাতেই হতে পারে- কারণ সে বাণীর আবেদন সকলের জন্য সমান। যে ভাষাতেই আল্লাহর বাণী বা হুকুমকে প্রকাশ করা হোক না কেন তা আল্লাহর কিতাব হিসেবে সেই ভাষাভাষী লোকের জন্য বৈধ এবং প্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয় এই কারণে, কারণ মাতৃভাষাতে কুর-আন পাঠের ফলে এর আবেদন, ব্যাখ্যা তাদের নিকট সহজেই হৃদয়গ্রাহী হবে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুযায়ী আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ হৃদয়ে ধারণ করতে সক্ষম হবে। কুর-আনের বাণীর প্রভাব এ ব্যাপারে অপূর্ব ।কুর-আনের বাণী সাধারণ এবং জ্ঞানী সকলকেই সমভাবে অভিভূত করতে সক্ষম।

মন্তব্যঃ অনেকের ধারণা আরবী বেহেস্তের ভাষা সুতরাং এ ভাষাতে কুর-আন পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও নেকী অধিক। [দেখুন নেকী শব্দটির অর্থ টিকা ২৯] কিন্তু এই আয়তটি থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে কুর-আন শরীফ আরবী ভাষাভাষী লোকদের বোঝার সুবিধার্থে আরবীতে নাজিল হয়েছে। এর অর্থ বুঝাতে হবে সেই অনুযায়ী জীবনকে পরিচালনা করতে হবে।

১৮৭৫। 'Mashiyat' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে "যাকে ইচছা।" কিন্তু শব্দটি ব্যপক অর্থে ব্যবহৃত । এর প্রকৃত প্রকাশ এক শব্দে করা সম্ভব নয় । এই শব্দটির অর্থ হবে বিশ্ব বিধাতার মহাপরিচালনা- যে পরিকল্পনার মাধ্যমে তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ন্যায়, সত্য, কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ তাঁর বিধানের প্রয়োগ।

৫। আমি মুসাকে আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম [এবং আদেশ করেছিলাম] তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকারের অতল থেকে আলোতে নিয়ে এসো এবং তাদের আল্লাহ্র দিনগুলিকে স্বরণ করতে শিক্ষা দাও ১৮৭৬। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা পরম ধৈর্য্যশীল দৃঢ়- কৃতজ্ঞ এবং উপলব্ধি ক্ষমতা সম্পন্ন। ১৮৭৭।

১৮৭৬: আল্লাহ্র দিবসগুলি এই বাক্যটির অর্থ সেই সব দিনগুলি যেদিন বিশেষভাবে আল্লাহর রহমত ও করুণাকে অনুধাবন করা যায়। আল্লাহর করুণা বান্দার জীবনের প্রতিটি দিন প্রতিটি পল, প্রতিটি ক্ষণ ও প্রতি মুহূর্ত আপ্লুত করে, বিধৌত করে। জীবনের প্রতিটি মূহূর্ত আল্লাহ্র করুণার স্বাক্ষর । তবুও ব্যক্তি বা জাতির জীবনে এমন দিন বা ক্ষণ আসে যা জাতির ইতিহাসে চিরস্বরণীয় যা জাতির বা ব্যক্তির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকে। আরবী বাগধারা "আই ইয়াম" বলতে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বলিত অতীত ইতিহাসকে বুঝায়। এই খানে সেই সকল দিন যেদিন জাতিসমুহের উত্থান পতন জয় পরাজয়, ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছিল। এখানে সেইদিনগুলি, যেদিনগুলিতে ইসরাঈলীরা মিসরে বন্দী অবস্থায় ভীষণ বিপদে অতিবাহিত করছিলো এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের রক্ষা করেন।

১৮৭৭: এই আয়াতে আরবী যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচেছ Sabbar যা Sabr সবর কথাটির সর্বতম বা সর্বোচ্চ ভাবকে প্রকাশ করে Sabr বা সবর কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে [২:৪৫] আয়াত ও টিকা ৬১ এবং [২:১৫৩] আয়াত ও টিকা ১৫৭তে Shakur এবং Shakir শব্দগুলির দ্বারা একইভাব বোঝানো হয়েছে, গুণকে উপলব্ধি করা, সনাক্ত করা, বা চিনতে পারা, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, সৎ কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । এই দুটি শব্দই আল্লাহর প্রতি বা মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে Shakur এবং Shakir শব্দটি থেকে সামান্যতম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।এই দুটি শব্দই আল্লাহ্র প্রতি বা মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে । Shakur শব্দটি, Shakir শব্দটি থেকে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।যথাঃ Shakur শব্দটি দ্বারা সামান্যতম অনুগ্রহকেও সনাক্ত করা ও তার জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করাকে বোঝায়। কৃতজ্ঞতা বোধ করা ব্যক্তির জীবনের অন্যতম মহৎ গুণ যার কথা কুর-আন শরীফে বহুবার ব্যক্ত করা হয়েছে। কৃতজ্ঞতা বোধ এক বিশেষ মানসিক অবস্থা [State of mind] যারা এই মানসকি অবস্থা প্রাপ্ত হয় তারা খুব সামান্য অনুগ্রহকে যে কোন অবস্থার প্রেক্ষিতেই হোক না কেন, তা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়। যারা বা যে জাতি এই অবস্থা প্রাপ্ত হয় তারাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ ভাজন । Shakir শব্দটি বৃহৎ কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য।

উপদেশঃ কৃতজ্ঞতা মানুষের অন্তরে শান্তি আনে আল্লাহর রহমতকে সনাক্ত করতে সাহায্য করে ফলে আল্লাহ্র উপরে নির্ভরশীলতা, আত্মসর্ম্পনের মনোবৃত্তি বৃদ্ধি করে ।

৬। স্মরণ কর ! মুসা তার লোকদের বলেছিল তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করেছিলেন । তারা তোমাদের কঠিন কাজের চাপে পীড়িত করতো, তোমাদের পূত্র সন্তানদের হত্যা

করতো এবং নারীদের জীবিত রাখতে । এতো ছিলো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা। ১৮৭৮।

১৮৭৮: দেখুন [২:৪৯] আয়াত। হযরত মুসা (আঃ) ও ইসরাঈলীদের কথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ এর দ্বারা কিতাবধারী সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাদের পূর্ববস্থা এবং তাদের কাছে পূর্বাবস্থার ভিত্তিতে আবেদন করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কোরেশদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের মাঝে আল্লাহ্ হযরত মুসার অপেক্ষা বড় নবীকে প্রেরণ করে তাদের বিশেষ নেয়ামতে ধন্য করেছেন। হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তওফীক প্রাপ্ত হয়, সে কোন সময় নেয়ামতের বরকত ও বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না ।" [মাযহারী]।

রুকু - ২

৭। এবং স্মরণ কর ! তোমাদের প্রভু [সর্ব সমক্ষে] ঘোষণা করেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তোমাদের প্রতি আরও [অনুগ্রহ] বৃদ্ধি করবো। কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও ১৮৭৯। আমার শাস্তি প্রকৃত পক্ষেই ভয়ানক।

১৮৭৯। Shakara শব্দটি দ্বারা মনের যে বিভিন্ন ভাব বা অবস্থা বোঝানো হয়েছে তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে উপরের টিকা ১৮৭৭তে। এখানে Kafara শব্দটির দ্বারা যে ভাবকে প্রকাশ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে (১) যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে আয়াত [২:৬] এবং টিকা ৩০তে এ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। (২) যারা আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহকে অস্বীকার করে, ইসরাঈলীদের উদাহরণের সাহায্য তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। এরা অকৃতজ্ঞ (৩) আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠিত হতে যারা বাঁধাদান করে যার উল্লেখ করা হয়েছে [৩:২১] আয়াতে অথবা আল্লাহ্র প্রেরিত দূতদের কার্যকে অস্বীকার করা যেমন বর্ণনা আছে [১৪:৯] আয়াতে । অপর পক্ষে Kafir শব্দটি ব্যবহার হয় শুধু মাত্র অবিশ্বাসীদের পরিবর্তে ।

উপদেশঃ আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য সওয়াব বা পুরস্কার বা তার নেয়ামত দান করবেন অপরপক্ষে অকৃতজ্ঞদের জন্য বলেছেনঃ "অবশ্যই আমার শাস্তি প্রকৃতপক্ষেই ভয়ানক।" প্রকৃতপক্ষে কথাটি এখানে অনুধাবণ যোগ্য।

৮। এবং মুসা বলেছিলেন তোমরা এই পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও ১৮৮০ তবুও আল্লাহ অভাব মুক্ত এবং সকল প্রশংসার যোগ্য ১৮৮১।

১৮৮০: অকৃতজ্ঞ হওয়া মনের এক বিশেষ অবস্থা [State of Mind] প্রাপ্ত হওয়া । অকৃতজ্ঞ হওয়ার অর্থ শুধুমাত্র মুখে বলা বা অন্তরে অনুভব করা নয়, এর অর্থ আরও ব্যাপক। যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায় এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের সকলের মনের যে অবস্থা তা হচ্ছে ঐ অকৃতজ্ঞ মনোভাবের প্রকাশ । যদি সমস্ত পৃথিবীর সকল মানুষ আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যায়, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহকে অস্বীকার করে, তবুও তারা আল্লাহ্র ক্ষমতাকে একবিন্দু হ্রাস করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট জীবের উপরে নির্ভরশীল নন। মানুষের অবাধ্যতা বা একগুয়েমী দ্বারা তাঁর মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, রহমত বা প্রশংসার যোগ্যতা একচুলও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না । কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আল্লাহ্র যেমন লাভ নাই, তেমনি প্রকাশ না করলেও আল্লাহ্র কোন ক্ষতি নাই। মানুষ কৃতজ্ঞ হবে তার নিজের মঙ্গলের জন্য । আত্মার শান্তির জন্য ।

১৮৮১ : দেখুন আয়াত [২২:৬৪], [২৯:৬]।

> ৯। [হে সম্প্রদায়ের লোক সকল] তোমাদের পূর্বে যারা [গত] হয়েছে তাদের কাহিনী তোমাদের নিকট পৌঁছায় নাই? নুহের সম্প্রদায় এবং আ'দ সম্প্রদায়, সামুদ সম্প্রদায় এবং তাদের পরে যারা এসেছিলো [তাদের কাহিনী]? আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কথা কেউ জানে না ১৮৮২। তাদের নিকট সুস্পষ্ট [নিদর্শনসহ] রাসুলগণ এসেছিলা। কিন্তু তারা তাদের হাত মুখে স্থাপন করে বলেছিলো ১৮৮৩, তোমাদের [যে ধর্ম প্রচারের জন্য] প্রেরণ করা হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করি এবং তোমরা যার প্রতি আমাদের আহ্বান করছো প্রকৃত পক্ষে আমরা [সে সম্বন্ধে উদ্বেগজনক] সন্দেহে রয়েছি। ১৮৮৪।

১৮৮২: পৃথিবীর সমস্ত নবী রাসুলদের নাম আমাদের জানা নাই। তাঁদের জীবন কাহিনীও আমাদের অগোচরে। তাঁদের সকলের জ্ঞান আল্লাহ্র নিকট । মানুষ তাদের সম্বন্ধে যতটুকু জানে, তা আমাদের আত্মিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে ও আধ্যাত্মিক জীবনের পথ নির্দ্দেশ দান করে।

১৮৮৩: তারা রাগে মুখে হাত স্থাপন করতো এবং নিজের আঙ্গুল কামড়াতো, অথবা রসুলদের কথা শুনে বিদ্রূপাত্মক হাসি চেপে রাখতে মুখে হাত দিত। আর এক অর্থে তারা রসুলদের কথা বলতে বাঁধা দান করতো। দুটোর যে কোনও অর্থ আমরা গ্রহণ করি না কেন, উপরের বাক্যটি দ্বারা অবিশ্বাসীদের, আল্লাহ্র রসুলের প্রতি অবাধ্য মনোভাবই প্রকাশ করা হয়েছে। ঠিক এই মনোভাবের প্রকাশই ঘটেছিলো কোরেশদের দ্বারা আল্-মুস্তফার (সা) প্রতি। এই মনোভাবের জন্যই তারা আল্লাহ্র বাণী প্রচারে রসুলকে (সা) বাধা দান করে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে ।

১৮৮৪ : দেখুন (১১:৬২) আয়াত । এই আয়াতের "Shakk" এবং Raib শব্দ দুটির পার্থক্য লক্ষ্য করার মত "Shakk" শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে মনের দ্বিধা । রসুলদের প্রচারিত বাণী সম্পর্কে বিশ্বাসের যে সন্দেহ, দ্বন্দ বিশ্বাস করবে কি না, মনের এই দোদুল্যমান ভাবকেই "Shakk" শব্দটি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে Raib শব্দটি মনের দ্বিধা দ্বন্দ ভাবের অনেক উর্দ্ধে। এই শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে সন্দেহ, অর্থাৎ রসুলদের প্রচারিত বাণীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা যে, হয়তো সম্পূর্ণ ব্যাপারটি শঠতা জুয়াচুরী ও ভন্ডতায় পরিপূর্ণ। মনের এই ভাব আত্মাকে অশান্তি, উদ্বেগে ক্ষতবিক্ষত করে । কারণ যা কিছু আমাদের নৈতিক বিশ্বাসকে আঘাত করে, তাই ই আমাদের আত্মার মঝে অশান্তি ও উদ্বেগ সৃষ্টির কারণ ঘটায়। সুরা [৫২:৩০] আয়াতে Raib শব্দটির অর্থ করা হয়েছে "বিপদ, বিপর্যয়" যা মন্দ কাজের শাস্তি স্বরূপ। উপরে বর্ণিত মানুষের দুরকম মানসিক অবস্থা, দ্বিধা, দ্বন্দ ও সন্দেহ যা কোরেশদের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা আল মুস্তফাকে (সা) আঘাত করে।

১০। রাসুলগণ তাদের বলেছিলেন, " আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে? তিনিই ১৮৮৫ তোমাদের আহ্বান করেন যেনো তিনি তোমাদের পাপ সমুহ ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং তোমাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিতে পারেন।" তারা বলেছিলো, "আঃ ! তোমরা তো আমাদের মত [সাধারণ] মানুষের থেকে বেশী কিছু নও! আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে [ঈশ্বরের] এবাদত করতো তুমি তা থেকে আমাদের ফিরিয়ে দিতে চাও। তাহলে আমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত কর।" ১৮৮৬।

১৮৮৫ : মানুষের অমুলক সন্দেহ ও মানসিক দ্বিধা দ্বন্দের প্রেক্ষিতে যুগেযুগে রাসুলেরা চেষ্টা করেছে সাধারণ মানুষের মনের এই অবস্থা থেকে মুক্ত করতে । আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তাকিয়ে দেখ তাঁর সৃষ্টির দিকে। আল্লাহর বাণী আমাদের নিজেদের সৃষ্টি নয়। তোমাদের প্রতারিত করার জন্য নিজেরা তা সৃষ্টি করি নাই। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী আমরা তা প্রচার করি। পূর্বের আয়াতে সন্দেহ প্রবণ যারা তারা বলেছিলো, "যার প্রতি তোমরা আমাদের আহবান কর" এরই উত্তরে রাসুলগণ বলেছেন যে, "আল্লাহ তোমাদের আহবান করেন আর তিনি তা করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করবার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দিবার জন্য।" অর্থাৎ তোমাদের অনুতপ্ত হয়ে সংশোধনের জন্য সময় দান করেন।

১৮৮৬ : এই আয়তটিতে অবিশ্বাসীদের যুক্তি ও তর্কের ধারণাটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদি রাসুলগণ বলতেন যে, তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করেন, তবে অবিশ্বাসীরা বলে,

"তোমরাও তো আমাদের মত সাধারণ মানুষ। তোমরা আল্লাহর কথা বলে আমাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে চাও। তাদের ধর্মই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তোমাদের এসব বলার কি অধিকার আছে?" এ কথার উত্তরে রাসুলগণ বলতেন যে, সর্ব শক্তির উৎস আল্লাহ্। অর্থাৎ যারা অবিশ্বাসী তারা সর্বদা মিথ্যা যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করবে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী ও রাসুলদের জীবনী থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর বাণীকে সব সময়েই প্রতিহত করা হয়েছে বার বার। এ কথা প্রাচীন যুগের জন্যও যেমন সত্য আমাদের রাসুলের (সা) জন্যও সত্য। একথা বর্তমান সময়েও সমানভাবে সত্য।

১১। তাদের রাসুলগণ বলেছিলো, "এটা সত্যি যে, আমরা তোমাদের মতই [সাধারণ] মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয় । সকল বিশ্বাসীগণ তাদের আস্থা আল্লাহ্র উপরে স্থাপন করুক।"

১২। "আল্লাহ্র উপরে আমাদের আস্থা স্থাপন না করার কোন কারণ নাই। আমরা যে পথের [অনুসরণ করি] প্রকৃত পক্ষে তিনি আমাদের সে পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা আমাদের যে আঘাত দিতেছ, আমরা তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করবো। যারা আস্থা স্থাপন করতে চায়, তারা আল্লাহর উপরে আস্থা স্থাপন করুক। "

রুকু-৩

১৩। অবিশ্বাসীরা তাদের রাসুলগণকে বলেছিলো, "নিশ্চয়ই জেনো আমরা তোমাদের আমাদের দেশ থেকে বের করে দেব, নতুবা তোমাদের আমাদের ধর্মে ফিরে আসতেই হবে ১৮৮৭।" কিন্তু তাদের প্রভু [এই বাণী] দ্বারা রাসুলগণকে অনুপ্রাণীত করেন। "অবশ্যই পাপীদের আমরা ধ্বংস করে দেবো।"

১৮৮৭ : এ কথা সত্য যে, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত নয় এবং আল্লাহতে অবিশ্বাসী তারা যে যুক্তি তর্কের অবতারণা করে তা শুধু মাত্র মনের আনন্দের জন্য, এর পিছনে তাদের কোনও সত্যানুসন্ধান নাই, আল্লাহকে পাওয়ার ইচছা নাই। তাদের প্রধান অস্ত্র হচেছ সন্ত্রাস বা পশুশক্তির বহিঃপ্রকাশ । কারণ অবিশ্বাসীদের পৃথিবী শুধুমাত্র পার্থিব ভোগবিলাস ও চাওয়া পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে কারণেই তারা বিশ্বাস করে যে, অত্যাচারের কাছে মুত্তাকী বা খোদাভীরু লোকেরা

আত্মসর্ম্পণ করবে। সে কারণেই তারা দেশ থেকে বহিঃস্কার ও অত্যাচার, কিংবা অবিশ্বাসীদের সাথে সহযোগীতা এর যে কোন একটি বেছে নিতে আল্লাহ্র রাসুলদের নির্দ্দেশ দান করে। কিন্তু আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসকে শক্তি দ্বারা অবদমিত করা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ্র প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, তার অন্তরে সাহস ও মনোবলকে সুদৃঢ় করেন স্বয়ং আল্লাহ্। অন্তরের অন্তস্থলে সে অনুভব করে যে, কাফেরদের অশুভ শাক্তি এবং সন্ত্রাস আল্লাহ্র শক্তির কাছে ধ্বংস হয়ে যাবে। বিশ্বাস এবং কল্যাণ শেষ পর্যন্ত স্থায়ীত্ব লাভ করবে। সত্য, ন্যায় এবং কল্যাণ শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে এবং অসত্য অন্যায় ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৪। "ওদের পরে আমিও তোমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই। এটা তাদের জন্য যারা আমার সম্মুখীন হওয়ার ও আমার বিচারের ভয় রাখে এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির। " ১৮৮৮।

১৮৮৮: "ভয় রাখে" - অর্থাৎ তাদের অন্তরে সর্বদা আল্লাহ্র উপস্থিতি কাজ করে, ফলে তারা কোন মন্দ বা অন্যায় কাজে অংশ গ্রহণে ভয় পায়। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, মন্দের ধ্বংস অনিবার্য। তারা সর্বদা তাদের আচরণ সংশোধনে তৎপর থাকে; যেনো ভবিষ্যতে তারা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে।

১৫। এবং তারা [আল্লাহর নিকট তৎক্ষনাত] বিজয় এবং সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করলো ১৮৮৯। [ফলে] প্রত্যেক ক্ষমতাশালী উদ্ধত সীমালংঘনকারীর ভাগ্যে নেমে এসেছিল হতাশা ১৮৯০।

১৮৮৯: দেখুন [৮:১৯] এই আয়াতে এবং পূর্বে উল্লেখিত আয়াতে "তারা" অর্থাৎ কাফিররা বিজয় কামনা করে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্বান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের সিদ্বান্ত তাদের ক্ষতি সাধন করলো। অথবা এই আয়াতটির অর্থ হবে যে, কাফিররা আল্লাহ্র বা আল্লাহ্র শাস্তিকে প্রতিদ্বন্দিতায় আহবান করলো। এবং তাদের সু সময়ে আল্লাহ্ তাদের সেই শাস্তি দান করেন। ফলে তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়। কোন কোন তফসীরকারের মতে "তারা" অর্থ পয়গম্বরগণ । সেক্ষেত্রে আয়াতটির অর্থ হবে, পয়গম্বরগণ বিজয়ের জন্য এবং সিদ্বান্তের জন্য প্রার্থনা করলেন, এবং কাফেররা সত্যকে অবদমিত করতে না পেরে হতাশ হলো।

১৮৯০ : দেখুন [১১:৫৯] আয়াত।

১৬। এদের প্রত্যেকের সম্মূখে রয়েছে জাহান্নাম এবং সেখানে তাদের পানীয় হিসাবে দেয়া হবে পুঁতি গন্ধময় পানি।

১৭। সাগ্রহে সে তাতে চুমুক দেবে, কিন্তু কখনো সে তা গলা দিয়ে নামাতে পারবে না। চারদিক থেকে তাকে মৃত্যু ঘিরে ধরবে, তথাপি সে মরবে না। এবং তার সামনে থাকবে নির্দয় শাস্তি ১৮৯১।

১৮৯১ : এই আয়াতটিতে দোযখের ভয়াবহ শাস্তির কথা তুলে ধরা হয়েছে। পুর্ববর্তী পয়গম্বরদের ধর্মোপোদেশেও ঠিক এই রকম বর্ণনা আছে। দোযখের শাস্তির কোন শেষ থাকবে না। এই শাস্তি পর্যায়ক্রমে ঘটে যেতেই থাকবে তা হবে অশেষ এবং চক্রাকার। পাপীদের কোন ধ্বংস নাই।অনন্তকালব্যাপি তারা যন্ত্রণা ভোগ করতেই থাকবে।

১৮। যারা তাদের প্রভুকে প্রত্যাখান করে তাদের উপমা হচেছ, তাদের কর্ম হবে ছাই সদৃশ্য, যার উপর দিয়ে ঝড়ের দিনের বাতাস প্রবল বেগে বয়ে যায়। ১৮৯২ । যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তাদের কাজে লাগানোর ক্ষমতা থাকবে না। [প্রকৃত লক্ষ্য থেকে] তা হবে বিপথে যাওয়া।

১৮৯২: এই আয়াতটি রূপক ও উপমা দ্বারা সমৃদ্ধ। যারা অবিশ্বাসী , যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাদের জীবন ও কর্মকে এখানে সুন্দর উপমার সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। যে কোন বস্তুকে অগ্নিতে দহন করলে পড়ে থাকে ছাই। যার সাথে প্রকৃত বস্তুর কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। বস্তুগুণে বা আকৃতিতে বা সৌন্দর্যে প্রকৃত বস্তুর সাথে পোড়ানোর পরে যে ছাই থাকে, দুটোর মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদিও ছাই ঐ সুন্দর বস্তু থেকেই উদ্ভুত, ঠিক সেইরূপ যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্মফল ঐ ছাই-এর মত অসার ও হালকা। ছাই যেমন আবর্জনারূপে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়, ঠিক সেইরূপ অবিশ্বাসীদের কাজও মূল্যহীন। আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন মানসিক দক্ষতা [Faculties of mind] দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই দক্ষতাই তাকে করে প্রাণীকুলের শ্রেষ্ঠ। তাকে করে গৌরবান্বিত মহিমান্বিত। এই মানসিক দক্ষতার ফসল তার কর্মফল। কিন্তু খোদাদ্রোহিতার ফলে, তার এই কর্মফল সুন্দর সোনালী ফসলে রূপান্তরিত না হয়ে আবর্জনারূপ ছাই এর মত হালকা ও অসার বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। কারণ আল্লাহ্ তাকে যে সুযোগ সুবিধা ও দক্ষতা দান করেছিলেন খোদাদ্রোহিতার ফলে সেসবের অপব্যবহার করে। আর অপব্যবহারের দরুন আল্লাহর নেয়ামত তার জীবনে সম্পদ না হয়ে অসার বস্তুতে রূপান্তরিত

হয়েছে। এই উপমার সাহায্যে আরও বুঝানো হয়েছে অবিশ্বাসীদের আত্মিক অবস্থানকে। আত্মা হচেছ পরম আত্মার অংশ। পৃথিবীর শিক্ষানবীশকালে আত্মার অবস্থান হচেছ পরম আত্মার সান্নিধ্য কামনার আকাঙ্খা। কম্পাসের কাঁটা যেরূপ সর্বদা উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে, কম্পাসের কাঁটার মত আত্মা স্রষ্টার দিকে মুখ করে থাকবে। কিন্তু আত্মা যখন খোদাদ্রোহিতার পাপে কুলষিত হয় তখন তার মাঝে আল্লাহ্র প্রতি একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। ছাই হালকা হওয়ার দরুণ বাতাস তাকে যত্র তত্র নিয়ে যায়। ঠিক সেরুপ এসব অবিশ্বাসী আত্মা আল্লার প্রতি একগ্রতা নষ্ট হওয়ার ফলে বিভিন্ন মতবাদে যত্র তত্র উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুড়ে বেড়ায়। বাতাসকে এখানে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই বাতাস সাধারণ মৃদুমন্দ বাতাস নয় এ হচেছ ঝড়ের দিনে প্রচন্ড বাতাস যা সারা বিশ্ব প্রকৃতিকে লন্ড ভন্ড করে দেয়। ঠিক সেই রূপ তাদের কর্মফলের দরুণ আত্মিক জীবন লন্ড-ভন্ড হয়ে যায়। ফলে তাদের জীবনের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, প্রশান্তি সব নষ্ট হয়ে যায়। জীবন শেষের শান্ত প্রশান্ত দিনগুলি তাদের চাওয়া পাওয়ার সীমানা থেকে বহু দূরে সরে যায়। তাদের কর্মফল তাদের জীবনকে ঝড়ের বাতাসের ন্যায় সবকিছু লন্ড-ভন্ড করে দেয়। তাদের সারা জীবনের পরিশ্রমকে করে নিষ্ফল ও অসার। ঝড়ের প্রচন্ড বাতাসকে আল্লাহ্র প্রচন্ড ক্রোধের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহর রহমত বঞ্চিত হওয়ার ফলে এসব লোক মানসিক শান্তি ও পার্থিব লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। আত্মার যন্ত্রণা তাদের বিভ্রান্তের ন্যায় দিগদিগন্তে পরিচালনা করে। হালকা ছাইয়ের ন্যায় তাদের নিজেদের মনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে থাকবেনা। এমনকি তাদের কৃত দুষ্কর্মের উপরেও তারা হবে নিয়ন্ত্রণহীন। তাদের সর্বসত্তা হয়ে যায় দূষিত ও কুলষিত। তাদের সকল চিন্তা ভাবনা চেতনা, ইচছা সব বিপথে চালিত হয়। তারা এতটাই বিপথে যায় যে, তাদের আর কোনও কিছুই নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তাদের চাওয়া পাওয়ার মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য থাকে না। তাদের অবস্থা কবির ভাষায় বলতে হয় "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই যাহা পাই তাহা চাই না।" তাদের চাওয়ার জগত ও পাওয়ার জগত হবে বিস্তর ব্যবধান। তাদের পৃথিবী হবে ভুলে ভরা, জীবন হবে তাদের জন্য দুর্বিসহ। " যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারে না। "

> ১৯। তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন ১৮৯৩। যদি তিনি ইচছা করতেন, তবে তিনি তোমাদের বিলোপ করে, [তোমাদের স্থলে] নূতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারতেন।

১৮৯৩: Haqq অর্থ সত্য, সঠিক, পূণ্য, সমতা , বাস্তবতা ইত্যাদি । আল্লাহ্র সৃষ্টি, ন্যায় ও সত্যের সমতা বিধানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যারা আল্লাহ্র প্রদত্ত ন্যায় ও সত্যের আইন মানে না, তারা অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের অবস্থানকে হারাবে এবং যারা তা মানে তাদের জন্য স্থান করে দিতে বাধ্য হবে। এই সতর্কবাণী আল্লাহ্ বারে বারে উচ্চারণ করেছেন এবং পৃথিবীর ইতিহাস আমাদের

এই সতর্কবাণীর পক্ষে সাক্ষ্য দান করে। যুগে যুগে সেই সব জাতিই পৃথিবীতে স্থায়ীত্ব লাভ করেছে যারা আল্লাহ্র প্রদত্ত নীতিমালা মেনে চলে। দেখুন [৬:৭৩] আয়াত।

২০। আল্লাহ্র জন্য তা কোন বিশাল বিষয় নয় ১৮৯৪।

১৮৯৪ : "Aziz" - অর্থ মহান, শক্তিশালী, পরমোৎকৃষ্ট, ক্ষমতাশালী দূর্লভদর্শন, বহুমূল্য।

২১। তার একত্রে শ্রেণীবদ্ধভাবে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে; তখন দূর্বলরা অহংকারীরদের বলবে ১৮৯৫, "আমরা তো কেবলমাত্র তোমাদেরই অনুসরণ করেছিলাম, আজকে তোমরা আল্লাহ্র শাস্তির বিরুদ্ধে আমাদের কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে কি?" তারা উত্তর করবে, "যদি আমরা আল্লাহ্র পথ নির্দ্দেশ পেতাম ১৮৯৬ তবে আমরা তা তোমাদের দিতাম। আমরা প্রচন্ড ক্রোধ দেখাই বা [এই শাস্তি]) ধৈর্যের সাথে সহ্য করি [এখন] তার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আমাদের জন্য নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ নাই। "

১৮৯৫ : শেষ বিচারের দিনে অবিশ্বাসীদের মধ্যে দুরকম বিভ্রান্তি দেখা যাবে (১) বিপথে চালিত একদল লোক অনুধাবনে অক্ষম যে, পৃথিবীতে প্রতিটি আত্মা স্ব স্ব কৃতকার্যের জন্য দায়ী। কেহ অপরের কর্মফলের দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। দেখুন [২:১৩৪] এরা তারাই যারা তাদের নিজ কৃত কর্মের দায় দায়িত্ব অপরের উপর চাপাতে সদা ব্যস্ত থাকে। কারণ তারা আশা করে যে যারা তাদের বিপথে চালিত করেছিল তারা শেষ বিচারের দিনে তাদের সাহাযার্থে এগিয়ে আসবে, তাদের কষ্ট লাঘবার্থে তারা কোন উপায় উদ্ভাবন করবে। এদের আবেদনের উত্তর দেয়া হয়েছে এই আয়াতের শেষাংশে। (২) যারা শয়তানের শক্তির উপরে নির্ভরশীল তাদের উত্তর আছে নীচের আয়াতে [১৪:২২]। নিষ্ঠুর সত্যকে নির্মমভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

১৮৯৬ : পৃথিবীতে যারা পুরোহিত, ধর্মযাজক বা পীর নাম ধারণ করে সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে বিপথে চালিত করতো শেষ বিচারের দিনে তাদের বিপদ সঙ্কুল অবস্থাকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে তারা ধর্মের নামে মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে, কিন্তু এখানে তারা কিভাবে মুক্তি পাবে? কারণ পৃথিবীতে তারা আল্লাহ্র হেদায়েত গ্রহণে অপারগ ছিলো, তারা বিপথে চালিত হয়েছিল এবং অন্যকেও চালিত করেছিলো তার প্রতিফল এখন তারা ভোগ করবে।

রুকু - ৪

২২। যখন [বিচারে] সব কিছুর সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে ১৮৯৭ শয়তান বলবে, "আল্লাহ্-ই তোমাদের সত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমিও দিয়েছিলাম কিন্তু আমি তোমাদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। তোমাদের আহবান করা ব্যতীত তোমাদের উপরে আমার কোন কর্তৃত্ব ছিলো না; কিন্তু তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছ। সুতারাং আমাকে ভৎর্সনা কর না, বরং তোমাদের নিজ আত্মাকে ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের আর্তনাদ শুনতে পাই না, তোমরাও আমারটা শুনতে পাও না। পূর্বে তোমরা আমাকে আল্লাহ্র সাথে যে শরীক করেছিলে, তোমাদের সে কর্ম আমি অস্বীকার করি। পাপীদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।" ১৮৯৮

১৮৯৭ : শয়তান মানুষের অন্তরে, চিন্তায় মিশে থাকে। শেষ বিচারের দিনে শয়তান তার স্ব-মূর্তিতে আর্বিভূত হবে। সে প্রচার করবে যে, "আমি তোমাদের প্রতারিত করছি। আল্লাহর প্রতিজ্ঞা সত্য। কিন্তু তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস না করে আমাকে বিশ্বাস করেছ। আমি তোমাদের বাধ্য করি নাই। আমি শুধুমাত্র তোমাদের আহবান করি। কিন্তু তোমরা আমার দিকে স্ব-ইচছায় দৌড়ে আস। এর দরুণ তোমরা নিজেরা নিজেদের দোষ দিবে। তোমরা কি মনে কর আমি আল্লাহর সমকক্ষ? কিন্তু আমি তো জানি আমি কখনই আল্লাহর সমকক্ষ নই। তোমাদের ভুলের খেসারত তোমাদের দিতে হবে। তোমরা তোমাদের প্রাপ্য শাস্তি লাভ করবে।"

১৮৯৮ : উপরের টিকা দেখুন ।এই বাক্যটির বিকল্প ব্যাখ্যা হতে পারে নিম্নরূপঃ; "আমি পূর্বেও আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিলাম আর তোমরাই সেই অবাধ্য ও আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীর সাথে আল্লাহকে অংশীদার করেছ।"

২৩। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করে , তাদের অবস্থান হবে [বেহেস্তের] বাগানে যার পাদদেশে প্রবাহিত হচেছ নদী। তাদের প্রভুর অনুমতি ক্রমে সেথায় তারা স্থায়ী হবে। তাদের প্রতি সম্ভাষণ হবে শান্তি। ১৮৯৯।

১৮৯৯: এই আয়াতটিতে পাপীদের শাস্তি ও বিপর্যয়ের বিপরীত অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে।

২৪। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকন? সদুপদেশের ১৯০০ তুলনা হচেছ উৎকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায়, যার শিকড় দৃঢ়ভাবে মাটিতে প্রোথিত এবং শাখা প্রশাখা আকাশে [পৌছায়] ।

১৯০০ : সদুপদেশ বা সৎ বাক্য এই শব্দটি ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে [Goodly word] যার অর্থ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আল্লাহর বাণী । আরও বিশদভাবে ও সাধারণভাবে প্রকাশ করতে হলে এর ব্যাখ্যা হবে শ্বাশত সত্য। ধর্মের যথার্থ অনুধাবনের মাধ্যমে যে সত্য ও সুন্দর বাণীর প্রকাশ ঘটে তা হৃদয়কে দয়া মায়া ও নির্মল আনন্দ ধারায় ভরিয়ে দেয়। ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দেয় স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য, মানুষের প্রতি কর্তব্য। মন্দ বাক্য এই ভাবধারার বিপরীত ভাব প্রকাশ করে যথাঃ ধর্মের নামে মিথ্যা, খোদাদ্রোহিতা, মিথ্যা প্রচার, হিংসা দ্বেষ, বিভেদ প্রচার, এবং পাপ কার্য এগুলিকে বলা যায় "মন্দ বাক্য"।

২৫। উহার প্রভুর অনুমতিক্রমে ইহা সর্বদা ফল প্রদান করে ১৯০১। এভাবেই আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা প্রদান করে থাকেন যেনো তারা সতর্কবাণী গ্রহণ করে।

১৯০১ : "উৎকৃষ্ট বৃক্ষ" এই বাক্যটি উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। উৎকৃষ্ট বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছ নিম্ন লিখিত ভাবধারা প্রকাশের জন্য : (১) যে বৃক্ষ হবে উৎকৃষ্ট, তা হবে অতুলনীয়। যার দর্শনে আত্মার মাঝে তৃপ্তি ও আনন্দের ভাব বিরাজ করবে। (২) সেই বৃক্ষ উৎকৃষ্ট যার শিকড় অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত। ঝড় ঝঞ্জায় যে বৃক্ষ থাকে অটল অনড় কারণ তার শিকড় মাটিতে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সুসংবিদ্ধ। (৩) যে বৃক্ষ উর্ধ্ব আকাশে তার শাখা প্রশাখা মেলে ধরে। যার শাখায় বহু পাখি বাসা বাঁধে, রাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। যার সুশীতল ছায়াতে রৌদ্রতপ্ত দিনে ক্লান্ত পথিক ও রৌদ্রতপ্ত পশু আশ্রয় পায়। (৪) যার ফল মানুষ ও পশুপাখিকে ক্ষুধা নিবারণে সাহায্য করে এবং তৃপ্তি দান করে। এ আয়াতে সদুপদেশকে বা সৎ বাক্যকে উৎকৃষ্ট বৃক্ষের উপমার সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। ক) সদুপদেশ বা আল্লাহর বাণীর সৌন্দর্য অতুলনীয়। আল্লাহর বাণী শ্বাশত সত্য ও সৌন্দর্য মন্ডিত। খ) আল্লাহ্র বাণীকে যে হৃদয়ে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে তার ঈমানের দৃঢ়তা ইস্পাতের ন্যায় দৃঢ় ও মজবুত, অনড় শিকড় বিশিষ্ট। দুনিয়ার বিপদ-আপদ একে টলাতে পারে না। পৃথিবীর কোন পরিবর্তনই তাদের ঈমানকে পরিবর্তন করতে পারে না। [দেখুন ১৪:২৭] পৃথিবীর ভুপৃষ্ঠের কোমল স্তরের বহু নিম্নে কঠিন শিলা স্তর বিদ্যমান। সে বৃক্ষের শিকড় ভৃপৃষ্ঠের কোমল স্তরকে ভেদ করে সেই শিলাস্তরে প্রোথিত হয় । উপরি ভাগের প্রচন্ড ঝড় ও বায়ূ প্রবাহ তাকে উপরে ফেলতে অক্ষম। ঠিক সেইরূপ সদুপদেশ বা সৎ বাক্যের শক্তি অপরিসীম। ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে দিক নির্দ্দেশক যন্ত্রের মত সৎ বাক্য ঈমানের শক্তিকে অটুট রাখে ও জীবনকে সুনির্দিষ্ট যাত্রাপথে পৌছে দেয়। (গ) সৎ বাক্যের ব্যপ্তি বিশ্বব্যপী উপরে, নীচে চতুর্দিকে । এর স্বর্গীয় দীপ্তি পাপী , পূণ্যবান, ছোট, বড়, ধনী গরিব সকলের জীবনকে আলোকিত করে। যার আশ্রয়ে সকল জীবন শান্তির আলয় খুঁজে পায়। (ঘ) উপরন্তু সৎ বাক্য বা আল্লাহর রহমত, বৃক্ষের সুস্বাদু ফলের ন্যায় । তবে এই ফল কোন ঋতু বা দেশে সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহর রহমত সর্ব দেশে সর্ব সময়ে

এবং সর্ব সাধারণের জন্য সমভাবে বহমান। যিনি আল্লাহর বাণীর প্রচারের মাধ্যম হিসাবে কাজ করেন তিনি হন অহংকার শূন্য তিনি জানেন তার সকল মহানুভবতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তি আল্লাহ্র দান। তিনি শুধু আল্লাহ্র ইচছার ধারক, বাহক ও প্রচারক মাত্র। এই উপমা স্বল্প কয়েকটি লাইনের মাধ্যমে ঈমানের আলো ও আধ্যাত্মিক শক্তির রূপকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২৬। এবং কুবাক্যের উপমা হচেছ এক মন্দ বৃক্ষ, যার শিকড় মাটির উপরিভাগ থেকে উৎপাটিত হয়েছে। এই [বৃক্ষের] কোন স্থায়ীত্ব নাই। ১৯০২।

১৯০২ : মন্দবাক্য বা কু বাক্য এখানে " মন্দ বৃক্ষ" উপমার সাহায্যে তুলনা করা হয়েছে। মন্দ বাক্য হচেছ সেই বাক্য যা মানুষকে পাপের পথে , প্রলোভনের পথে পরিচালিত করে । যে বাক্য মানুষকে আল্লাহর নির্দ্দেশিত পথ থেকে দুরে সরিয়ে নেয়। "নিকৃষ্ট বৃক্ষ" হচেছ উৎকৃষ্ঠ বৃক্ষের বিপরীত রূপ। এই খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপে বর্ণিত করা হয়েছে যে, এর শিকড় ভুগর্ভের অভ্যন্তরে বেশী যায় না। ফলে যে কেউ এই বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। অর্থাৎ পাপ ও মন্দ কাজ পৃথিবীতে দীর্ঘ স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না। একদিন তা সমূলে উৎপাটিত হবে এবং শেষ পর্যন্ত তা স্থায়ী হবে না। পরবর্তী টিকাতে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

২৭। যারা শ্বাশত সত্যবাণীতে বিশ্বাসী, আল্লাহ তাদের দুনিয়াতে এবং আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু যারা পাপ করে, আল্লাহ তাদের বিভ্রান্তিতে পরিত্যাগ করবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা করেন ১৯০৩।

১৯০৩: যারা বিশ্বাসী তাদের শক্তি দান করেন স্বয়ং আল্লাহ। আল্লাহর ইচছা এবং আল্লাহর পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবেই। সব কিছুর উপরে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ্।

রুকু -৫

২৮। তুমি কি তোমার দৃষ্টিকে তাদের দিকে প্রসারিত কর নাই যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং [ফলে] তার সম্প্রদায়কে ধ্বংসের মাঝে নামিয়ে আনার কারণ হয় ১৯০৪;-

১৯০৪ : এই আয়াতটি যদিও নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য ছিলো কিন্তু এই আয়াতটির অর্থ এবং প্রয়োগ সর্বজনীন। নির্দিষ্ট ঘটনাটি ছিল এরূপ, সে সময় মক্কার মোশরেক কোরেশরা কাবা

ঘরকে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনালয়ে পরিণত করেছিল এবং তারা সেখানে অদ্ভুদ সব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করত। আল্লাহ্র রাসুল (সা) আল্লাহ্র নেয়ামত স্বরূপ মানুষের জন্য। মোশরেকরা খোদাদ্রোহিতা ও কুসংস্কারের ফলে বিপথে চালিত হয় এবং তাদের ধর্মকে এক আল্লাহর উপসনার পরিবর্তে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনায় পরিবর্তিত করে। এর ফলে শুধু তারাই যে বিপথে চালিত হয় তা নয়, তারা অন্য সকল লোককেও বিপথে চালিত করতে সাহায্যে করে। ফলে তারা আল্লাহর নেয়ামত বা শিক্ষা যা রাসুলের (সা) মাধ্যমে প্রেরিত তা গ্রহণে হয় অপারগ শুধু তাই-ই নয় রসুল (সা) এবং তাঁর অনুগামীদের উপরে তাদের অত্যাচার ছিলো সীমাহীন। এভাবেই তারা তাদের অন্যায়ের পাত্র পরিপূর্ণ করে। আর যাদের জীবন পাত্র অন্যায় দ্বারা পরিপূর্ণ ধ্বংস তাদের অনিবার্য। এই আয়াতটি হিজরতের পূর্বে মক্কাবাসী মোশরেকদের অবস্থা ও তাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে। কিন্তু এই ভবিষ্যত বাণী সর্বযুগে সকল অত্যাচারীদের এবং মোশরেকদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য । সাধারণ ভাবে এখানে এই উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, যারা স্বার্থপর তারা তাদের ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য আল্লাহর দেখানো রাস্তাকে পরিবর্তিত করে কাল্পনিক মুর্তির পূজা করে এবং অন্যকেও উৎসাহিত করে। এ সব স্বার্থপর লোকের একটাই উদ্দেশ্য আর তা হচ্ছে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা। কিন্তু আল্লাহর হুকুম হচেছ ক্ষমতার প্রয়োগ হতে হবে ভালোর জন্য, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু এসব স্বার্থপর লোকেরা নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে, ভালোকে অবদমিত করে ও মন্দকে প্রতিষ্ঠিত করে । এদেরই অবস্থান দোযখের আগুনে। আয়াতে [১৪:৩০] বর্ণনা করা হয়েছে এদের সম্বন্ধে "উপভোগ করে নাও" অর্থাৎ ক্ষমতা প্রভাব প্রতিপত্তি ভোগ করে নাও।

২৯। জাহান্নামের মাঝে [নিক্ষিপ্ত করার]; সেখানে তারা অগ্নিতে দগ্ধ হবে- কত নিকৃষ্ট এই আবাস স্থল।

৩০। তারা আল্লাহর সমকক্ষ [উপাস্য] নির্ধারণ করে, [মানুষকে] পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য । বল, [তোমাদের ক্ষণিক ক্ষমতা] উপভোগ করে নাও। তোমরা সরাসরি জাহান্নামের জন্য তৈরি হচছ।

৩১। আমার বান্দাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদের বল ১৯০৫ তারা যেন নিয়মিত সালাত আদায় করে, এবং তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে [দানের জন্য] ব্যয় করে (১৯০৬) গোপনে ও প্রকাশ্যে, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয় বিক্রয়

ও বন্ধুত্ব থাকবে না । ১৯০৭।

১৯০৫: ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে , যখন মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে মুসলমানদের জান মালের কোন নিরাপত্তা ছিল না। শক্তিশালী কাফেরদের তুলনায়, মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি সবই ছিলো অকিঞ্চিতকর। হিজরতের পূর্বে তখন মুসলমানদের যে অবস্থা ছিল, নিজেদের সেই অবস্থায় কল্পনা করলেই শুধু আমরা অনুভব করতে পারব নও মুসলমানদের ঈমানের দৃঢ়তা। এই দৃঢ়রা তারা লাভ করেছিল আল্লাহর উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে ও অন্যের প্রতি সহযোগীতার মনোভাবের দ্বারা তারা তা অর্জন করেছিলেন। হিজরতের পূর্বে সেই দিনগুলো ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যাচারে অবিচারে ভরা। তাদের জীবন ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা ছিল না। তাদের মান সম্মান ধূলায় লুণ্ঠিত করা হতো। সেই দুর্যোগময় দিনে তারা শক্তি, সাহস ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করতেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে, পরস্পরের মধ্যে সাহায্য সহযোগীতার হাত সম্প্রসারণের মাধ্যমে। "সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে।" আল্লাহ রাসুলকে (স) "বল" কথাটি দ্বারা প্রচারের আদেশ দিয়েছেন।

১৯০৬ : "যে জীবনোপকরণ দিয়েছি" এই বাক্যটিকে শাব্দিক অর্থে বা রূপক অর্থে উভয় অর্থেই ব্যবহার করা যায়। দেখুন [২:৩] আয়াত ও টিকা নং ২৭। প্রচারের প্রথম যুগে মুসলমানদের অনেকেই ছিলেন গরিব,ক্রীতদাস, অথবা অত্যাচারিত। তাদের অনেকেই মুসলিম হিসাবে ঈমানের দরুণ জীবন ধারণের নূন্যতম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতো । মুসলমানদের উপরে মোশরেকদের অত্যাচারের এও ছিলো এক বিশেষ ধরণ। তাদের জন্য খাদ্য , বস্ত্র, আশ্রয়ের প্রয়োজন। মুসলমানদের মধ্যে যাদের খাদ্য সাহায্য করার যোগ্যতা আছে তাদের এসব দুস্থ মুসলমানদের সাহায্য সহযোগীতার হাত সম্প্রসারণ করতে বলা হত। এই অবস্থায় দান করতে বলা হচেছ প্রকাশ্যে বা গোপনে। গোপনে করতে হবে এজন্য যেন দাতার মনে কোন অহংকার না জন্মে, প্রদর্শনের ইচ্ছা না জন্মে। আবার এমন হতে পারে যে শত্রুরা দানের উৎসের সন্ধান পেলে তা ধ্বংস করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে। আবার দানকে প্রকাশ্যে করতে বলা হয়েছে এজন্য যে, যারা অভাব গ্রস্ত তারা যেন জানতে পারে যে, কোথায় গেলে সাহায্য সহযোগীতা পাওয়া যেতে পারে।

১৯০৭: "সেই দিন" অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনকে বুঝানো হয়েছে। শেষ বিচারের দিনে পৃথিবীর মানদন্ড সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। পৃথিবীর মানদন্ডে সম্পদের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। কিন্তু "সেই দিন" পৃথিবীর সম্পদের কোন মূল্যই থাকবে না; কোন সাহায্যেই তা আসবে না। সে কারণে সময় ও সুযোগ থাকতে পৃথিবীতে সম্পদের সৎ ব্যবহার করা প্রয়োজন। পৃথিবীর সম্পদের পরিবর্তে শেষ বিচারের দিনে কি লাভবান হওয়া অধিক গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অনুবাদ করা যায় ক্রয়, বিক্রয়, পণ্যবিনিময় দ্বারা বাণিজ্য, লাভজনক আদান প্রদান

ইত্যাদি। অর্থ সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান সন্দেহ নাই তবু এই অর্থ সম্পদের পরিবর্তে দানের মাধ্যমে পরকালের জন্য নিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধান করা সকলের প্রয়োজন। কারণ শেষ বিচারের দিনে প্রত্যেককে প্রত্যেকের কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। অন্যের পাপের বোঝা কেউ বহন করবেনা। আবার অন্যের পূণ্যের অংশীদারও কেউ হতে পারবে না। ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব-ই হবে পরকালের বিচারের একমাত্র মানদন্ড। সুতরাং এই পৃথিবীতে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যের মাধ্যমে আমরা পূণ্যাত্মাদের সামিল হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করতে পারি। এভাবেই ব্যক্তিগত কর্মের দ্বারা পরকালের সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াতে পারি।

৩২। আল্লাহ্-ই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং [তিনি] আকাশ থেকে বৃষ্টি প্রেরণ করতে থাকেন, যার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপন্ন করে থাকেন। তিনি-ই তোমাদের জন্য নৌযানকে তোমাদের নিয়ন্ত্রাধীন করেছেন যেনো, সেগুলি আল্লাহর হুকুমে সমূদ্রে চলাচল করতে পারে। এবং যিনি নদী সমূহকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। ১৯০৮।

১৯০৮: মানুষকে আল্লাহ বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন। মানুষের দক্ষতা, ক্ষমতা, শক্তি, প্রতিভা মেধা, মননশীলতা সবই সেই বিশ্ব স্রষ্টার দান, যা তিনি শুধু মানুষকে দান করেছেন। পৃথিবীর অন্য প্রাণীকে দান করেন নাই। পৃথিবীর মানুষ প্রাকৃতিকে জয় করে নিজের আয়ত্তাধীন করছে। কিন্তু তার অনুধাবন করা উচিত যে, সে তা করতে পেরেছে কারণ (১) প্রকৃতি জয় করার যে দক্ষতা ও ক্ষমতার প্রয়োজন তা মানুষকে আল্লাহ্ দান করেছেন সৃষ্টির আদিতে। আল্লাহর এই বিশেষ নেয়ামতে মানুষ ধন্য (২) প্রকৃতির জন্য আল্লাহ্ তার আইন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। প্রকৃতির এই নির্দিষ্ট আইনকে নিজের করায়ত্ব করার ক্ষমতা আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। আল্লাহ্র হুকুম ও অনুমতি সাপেক্ষেই মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে পারে। কারণ আল্লাহ মানুষকে তার প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন [২:৩০] সে কারণেই আল্লাহ্ ফেরেশতাদের হুকুম করেছিলেন আদমকে সেজদা করতে [২:৩৪] । যেখানে ফেরেস্তারা আদমের নিকট নতজানু হয় , সেখানে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে প্রকৃতিকে মানুষের দাস করে দিবেন সেটাই স্বাভাবিক । আল্লাহর হুকুমে মানুষ বৃষ্টির পানি ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন করতে পারে, সমুদ্রে নিরাপদে জাহাজ চালনা করতে পারে। নদীকে চলাচলের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, নদী থেকে খাল কেটে সেচ কাজে ও চলাচলের মাধ্যম হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ প্রকৃতিকে করায়ত্ব করে প্রাকৃতিক সকল সম্পদের সদ্ব্যবহার সে করতে পারে, সেই বিশেষ দক্ষতা, ক্ষমতা তাকে আল্লাহ দান করেছেন। পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র প্রকৃতি নয় গ্রহ নক্ষত্রকেও মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩৩। তিনি সূর্য চন্দ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন ১৯০৯। এরা প্রত্যেকেই অধ্যাবসায়ের সাথে নিজ নিজ গতি পথ অনুসরণ করছে। এবং রাত্রি ও দিনকে তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।

১৯০৯: পৃথিবী থেকে যোজন কোটি দূরে সূর্য ও চাঁদকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। আমরা জানি আমাদের সকল শক্তির উৎস সূর্য । জীবনের সকল স্পন্দন পৃথিবী থেকে মুছে যাবে যদি সূর্য না থাকে। সূর্য আছে বলেই পৃথিবীর ঋতুর পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন বর্ণে পৃথিবী সজ্জিত হয়। বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী উৎপন্ন করে । শুধু তাই নয় আমাদের স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি সবই সূর্যালোকের সাথে ওতপ্রেতভাবে জড়িত । সূর্য এবং চন্দ্রের প্রভাবে জোয়ার ভাঁটা হয়, প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। সূর্যের প্রতিদিনের পরিক্রমায় দিন ও রাতের সৃষ্টি হয়। যা থেকে আমরা সময়ের ধারণা করতে পারি। অপরপক্ষে চাঁদের নরম আলো শুধু যে নয়নাভিরাম তাই-ই নয়, চাঁদের সাথে আমাদের সময় সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় হিসাব বিদ্যমান। মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ড দিন ও রাত্রির পর্যায়ক্রমের সাথে বিদ্যমান, আর এভাবেই সূর্য চন্দ্র নির্দিষ্ট নিয়মের অনুবর্তী হয়ে মানুষের সেবায় নিয়োজিত।

৩৪। তোমরা যা আকাঙ্খা কর তিনি তা দিয়ে থাকেন ১৯১০। তোমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহ সমূহ গণনা কর, তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না। প্রকৃত পক্ষে মানুষ অন্যায় ও অকৃতজ্ঞতার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। ১৯১১।

১৯১০ : " তোমরা যা আকাঙ্খা কর " অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও আন্তরিক প্রার্থনার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করলে, আল্লাহ বান্দার সে ইচছা পূরণ করেন। সে কারণেই মহাজ্ঞানী বদান্য সর্বশাক্তিমান আল্লাহ মানুষের যা প্রয়োজন তা দান করেছেন।

১৯১১।জালিম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে মানুষের অন্যায় করার প্রবণতা বোঝনোর জন্য। যা সঠিক, যা সত্য যা ন্যায়, তা প্রতিরোধ করার প্রবণতাকে বোঝানোর জন্য জালিম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অকৃতজ্ঞ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে মানুষ যখন আল্লাহ্র অশেষ রহমতকে সনাক্ত করতে অক্ষম হয় সেই অবস্থাকে বোঝানোর জন্য। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর অসংখ্য রহমতে আমরা ধন্য। তবুও আমরা তা বুঝতে অক্ষম।

রুকু -৬

৩৫। স্মরণ কর! ইব্রাহীম বলেছিলো ১৯১২ "হে আমার প্রভু! এই নগরীকে শান্তি ও নিরাপত্তার নগরীতে পরিণত কর! আমাকে এবং আমার পুত্রদের মূর্তি পূঁজা থেকে দূরে রেখো"। ১৯১৩।

১৯১২ : হযরত ইব্রাহীম ছিলেন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি । তিনি ছিলেন বিশ্বাসে অটল। সেমেটিক জাতির পূর্ব পুরুষ এবং তাদের পয়গম্বর হিসাবে তাকে পরিগণিত করা হয়। আয়াত [১৪: ৩১-৩৪] গুলিতে যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে হযরত ইব্রাহীমের প্রার্থনার মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটেছে। সে কারণেই এই স্থানে হযরত ইব্রাহীমের প্রার্থনাকে সন্নিবেশ করা হয়েছে। কিভাবে কাবা শরীফ হবে নতুন প্রত্যাদেশের কেন্দ্রবিন্দু । প্রার্থনা, দান, আল্লাহ্র প্রতি এবং মানুষের প্রতি ভালবাসা, আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে আল্লাহকে অনুভব করার ক্ষমতা, সর্বোপরি মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা ও আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা থেকে বিরত থাকার জন্য হযরত ইব্রাহীম প্রার্থনা করেন। তার প্রার্থনাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (১) আয়াত [১৪: ৩৫-৩৬] এই দুটি আয়াতে হযরত ইব্রাহীম নিজের তরফ থেকে প্রার্থনা করেছেন। তার সম্বোধনের ভাষা ছিল "হে আমার প্রভু" (২) আয়াত [১৪: ৩৭-৩৮] এই আয়াত দুটিতে তিনি আল্লাহকে সম্বোধন করেন, হে আমাদিগের প্রভু বলে। এখানে তিনি এবং তার বংশধরদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করেছেন, বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, তার জেষ্ঠ্য পুত্র ঈসামাইলের বংশধরদের কথা (৩) আয়াত [১৪ : ৩৯-৪০] এই দুটি আয়াতে তিনি নিজের পক্ষ ও তার বংশধরদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করেছেনে। এখানে তিনি তার বংশধরদের দুটি শাখার উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ঈসমাইল ও ইস্হাক উভয়ের উল্লেখ আছে। (৪) [১৪:৪১] এই আয়াতটি তিনি তার নিজের জন্য, তাঁর পিতা মাতার জন্য এবং সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। স্থান কাল, পাত্র জাতি ভেদে সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা, ইসলামের বিশ্ব-জনীন রূপকেই প্রকাশ করেছে।

১৯১৩: দেখুন [২: ১২৫-১২৯] হযরত ইব্রাহীম হযরত ইসমাঈল সহযোগে কাবা ঘরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। হযরত ইব্রাহীম তার র্নির্মিত কাবা ঘরের জন্য আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করেন ও তার বংশধরদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

৩৬।" হে আমার প্রভু ! মানুষের মধ্যে অনেককে তারা অবশ্যই বিপথে চালিত করেছে। এরপরে, যে আমার [পথ] অনুসরণ করবে, সে আমার দলভূক্ত এবং কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো বার বার ক্ষমাশীল এবং পরম করুণাময়।

৩৭।" হে আমাদের প্রভূ! আমি আমার বংশধরদের কতককে তোমার পবিত্র গৃহের

নিকট অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করাইলাম ১৯১৪। হে প্রভু! এটা এ জন্য যে, তারা যেনো নিয়মিত সালাত কায়েম করে। সুতরাং মানুষের মধ্যে কিছু লোকের হৃদয়কে তাদের প্রতি ভালোবাসাতে পূর্ণ করে দাও এবং ফলমূল দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর ১৯১৫ যেনো তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।

১৯১৪ : মক্কা শহরটি চর্তুদিকে পর্বত দ্বারা বেষ্টিত উপত্যকায় অবস্থিত । মদিনা শহরের মত এখানে কোন সমভুমি নাই, যেখানে কৃষি কাজ করা যায়। যেহেতু মক্কা পর্বত দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার ফলে বাহিরের সাথে এর যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়। সেই কারণে এই স্থান জনকোলাহল মুক্ত হয়ে প্রার্থনা ও আল্লাহর ধ্যানের উপযুক্ত হয়ে উঠে।

১৯১৫ : দেখুন [২:১২৬] আয়াত এবং টিকা নং ১২৮ । সেখানে ফল কথাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পূণ্যাত্মা লোকেদেরও আহার এবং খাদ্যের প্রয়োজন আছে। যদিও রিযিক শব্দটি এখানে আক্ষরিক ও আলংকারিক উভয় অর্থেই প্রযোজ্য । আর্থাৎ শারীরিক ও আত্মিক উভয় প্রকার বিকাশের জন্য আল্লাহর রহমতের প্রয়োজন । কিন্তু তবুও পূণ্যাত্মা ব্যক্তিদের জন্যও তার সগোত্রের লোকদের ভালোবাসা ও সমবেদনার প্রয়োজন আছে।

৩৮।" হে আমাদের প্রভু! তুমি তো [সব] জান আমরা যা গোপন করি এবং আমরা যা প্রকাশ করি। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কোন কিছুই আল্লাহ্র নিকট থেকে গোপন থাকে না। ১৯১৬।

১৯১৬: হযরত ইব্রাহীম তাঁর পয়গম্বর সূলভ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে হযরত ইসহাকের বংশধরের দ্বারা ঘৃণা ও শত্রুতার সম্মূখীন হবে হযরত ইসমাঈলের বংশধরেরা [আরব] তিনি সে কারণেই আল্লাহর কাছে তাদের সকলের ইসলামের নিকট আত্মসর্ম্পণের জন্য প্রার্থনা করেন।

৩৯।" সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসাহাককে দান করেছেন। সত্যিই আমার প্রভু প্রার্থনা শ্রবণকারী । ১৯১৭।

১৯১৭ : যখন ইসাহাকের জন্ম হয় তখন হযরত ইব্রাহীমের ১০০ বৎসর বয়স ছিল এবং তাঁর ৯৯বছর বয়সের সময় তার বড় ছেলে হযরত ইসমাঈলের বয়স ছিলো ১৩ বৎসর । সেভাবেও হযরত ইসমাঈলও ছিলেন হযরত ইব্রাহীমের বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, অর্থাৎ তার বয়স যখন ৮৬

বৎসর তখন হযরত ইসমাঈলের জম্ম হয় । হযরত ইব্রাহীমের ছোট সন্তান ইসহাকের বংশধর হচেছ ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বীরা । তাঁর বড় ছেলে ইসমাঈলের বংশধরেরা কালক্রমে সর্বজনীন ধর্ম ইসলামকে গ্রহণ করে; যা হচেছ হযরত ইব্রাহীমের ধর্ম।

৪০। "হে আমার প্রভু ! আমাকে তাদের একজন কর, যারা নিয়মিত সালাত কায়েম করে,এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও [কর] ১৯১৮। হে আমার প্রভু তুমি আমার প্রার্থনা গ্রহণ কর।

১৯১৮ : হযরত ইব্রাহীম তার বংশের উভয় শাখার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন। কারণ তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে ভূত ভবিষ্যত সবই প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম ছিলেন। যা পরবর্তী ইসরাঈলীরা অনুধাবনে অক্ষম হয়।

৪১। "[হে আমার প্রভু] ১৯১৯, আমাকে আমার পিতামাতাকে এবং [সকল] মুমিনদের তুমি তোমার ক্ষমার পক্ষপুটে আশ্রয় দান কর, সেইদিন, যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে- ১৯২০,১৯২১,১৯২২।"

১৯১৯ : পড়ুন টিকা নং ১৯১২। হযরত ইব্রাহীম তার বংশধরের জন্য প্রার্থনা শেষ করে এই আয়াতে নিজের জন্য তার পিতা মাতার জন্য এবং সকল বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন।

১৯২০ : "ক্ষমা" শব্দটির বিভিন্ন অর্থের জন্য দেখুন আয়াতের [২: ১০৯] টিকা- ১১০।

১৯২১: "পিতা মাতাকে" হযরত ইব্রাহীমের পিতার পরিচয় হচেছ, তিনি ছিলেন ঘোর পৌত্তলিক [৪০:২৬, ৬:৭৪]। শুধু তাই নয় তিনি বিশ্বাসীদের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং হযরত ইব্রাহীমকে পাথর দ্বারা আঘাত করা ও নির্বাসনের ভয় প্রদর্শন করেন [১৯:৪৬] তিনি ও তার অনুসারীরা হযরত ইব্রাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করেন [২১:৫২:৬৮] এর পরেও হযরত ইব্রাহীমের হৃদয় তার পিতার জন্য দয়া ও করুণার আর্দ্র থাকতো। তিনি তার পিতা মাতার জন্য আল্লাহর করুণা ভিক্ষা করেন। কারণ তিনি এ বিষয় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ছিলেন; [৯:১১৪, ১৯:৪৭] যদিও তিনি তার পিতৃভূমি থেকে বিতারিত হন।

১৯২২ : "সেই দিন" অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন সকল পার্থক্য ,অসাম্য অবিচারকে মূল্যায়ন করা হবে। পৃথিবীর কেহই দোষত্রুটির উর্দ্ধে নয়। মানুষ মাত্রই ভুল ত্রুটি করবেই। সেইদিন সর্বোচ্চ পূণ্যাত্মা যিনি, তাকেও আল্লাহ্র রহমত কামনা করতে হবে। হযরত ইব্রাহীমের মোনাজাতের

মাধ্যমে এই সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে। পয়গম্বর প্রধান হযরত ইব্রাহীম সকল বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছেন কারণ ইসলাম হচেছ সর্বজনীন ধর্ম।

রুকু -৭

৪২। মনে করো না যে, যারা পাপ করে আল্লাহ্ তাদের কাজ সম্বন্ধে মনোযোগী নন। তিনি তাদের অবকাশ দেন সেই দিন পর্যন্ত যেদিন আতঙ্কে তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে;

৪৩। তারা [দিগবিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে] ছুটোছুটি করবে, তাদের ঘাড় থাকবে প্রসারিত, মাথা থাকবে [আকাশের দিকে] উচু করে রাখা, তারা নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না; এবং তাদের হৃদয় হবে বিকল [ভয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা শূন্য] ১৯২৩।

১৯২৩ : এই আয়তটিতে শেষ বিচারের দিনে পাপীদের আতঙ্কের বর্ণনা করা হয়েছে। যারা পাপী তারা যখন অনুধাবন করতে পারবে যে, তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করতেই হবে, তখন তারা আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। ভয়ে আতঙ্কে তাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে যাবে। বিস্ফারিত চক্ষু আর স্ব- আকৃতিতে ফিরে আসে না। ভয় ও বিকল চিত্তে মাথা আকাশের দিকে মাথা তুলে প্রাণপণ দৌড়াবে। তাদের অন্তর হবে আশা শূন্য । কারণ তাদের পাপ তাদের নিকট হবে উদ্ভাসিত, ঠিক এই অবস্থাতে তারা বিচারের জন্য নীত হবে।

৪৪। সুতরাং মানব জাতিকে সেই দিন সম্পর্কে সাবধান কর যেদিন [আল্লাহ্র] ক্রোধ তাদের নিকট পৌছবে। সেদিন পাপীরা বলবে । "হে আমাদের প্রভু আমাদের অবকাশ দাও [কেবলমাত্র] স্বল্প কালের জন্য । আমরা তোমার আহবানে সাড়া দেবো,ঁ এবং তোমার রাসুলদের অনুসরণ করবো।" কি [আশ্চর্য] তোমরা কি ইতি পূর্বে শপথ করে বলো নাই যে, তোমাদের পতন হবে না। ১৯২৪।

১৯২৪: "Zawal" যার অর্থ উন্নতির মধ্যকাশ থেকে পতন; যেরূপ সূর্য মধ্যকাশ থেকে আবার নীচে দিকচক্রবালে যাত্রা করে। যারা বিশ্বাসী নয় তারা ধারণা করে যে, তাদের ক্ষমতা সর্বদা একই রকম থকবে। তাদের এই ধারণার কারণ আল্লাহ্ পৃথিবীতে তাদের যে অর্থ সম্পদ ও ক্ষমতা ভোগ

করতে দিয়েছেন তারা তা মনে করে অনন্তকালব্যাপি তাদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। তার জন্য তাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ যুগে যুগে সকলকে সাবধান করেছেন। এই আয়াতে সমসাময়িক মোশরেক আরবদের সাবধান করা হয়েছে কিন্তু এই উপদেশ সর্বকাল ও সবজাতির জন্য প্রযোজ্য।

৪৫। অথচ তোমরা বাস করতে তাদের বাসভুমিতে যারা নিজেদের আত্মাকে পাপে নিমজ্জিত করেছিলো। তোমাদের দেখানো হয়েছিলো তাদের আমি কি পরিণতি করেছিলাম এবং তোমাদের [বোঝার] সুবিধার জন্য [অনেক] উপমা তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছি।

৪৬ । তাদের চক্রান্ত ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু তাদের চক্রান্ত ছিলো আল্লাহর দৃষ্টি সীমার মধ্য যদিও তা এমন [শক্তিশালী] ছিলো যাতে পাহাড় সমুহ কেঁপে উঠতো।

৪৭। কখনও চিন্তা করো না যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসুলদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমতায় সর্বোচ্চ, দন্ড- বিধায়ক।

৪৮। একদিন এই পৃথিবী অন্য পৃথিবীতে রূপান্তরিত হবে ও আকাশ মন্ডলীও [অনুরূপ হবে] ১৯২৫ [মানব গোষ্ঠী] শ্রেণীবদ্ধভাবে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে- যিনি এক, অপ্রতিরোধ্য।

১৯২৫: এই আয়াতে বলা হয়েছে রোজ কেয়ামতের দিনে আকাশ পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মান্ডের রূপ যাবে পাল্টে। বিশ্ব ভূবন ও নভোমন্ডলকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করা হবে। এর আরও বর্ণনা আছে নিম্নলিখিতঃ আয়াত সমূহে [২০: ১০৫-১০৭, ৭৩:১৪, ৮২:১,৮৪:৩] এছাড়াও [৫৬:৬০-৬২] তে বর্ণনা করা হয়েছে মানুষের পুনরুথানের সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছে মানুষকেও নুতন আঙ্গিকে সৃষ্টি করা হবে। এই নতুন সৃষ্টির (১) অবস্থা হবে বর্তমান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের চেনা জানা পৃথিবীর রূপ যাবে পাল্টে। পরবর্তী আয়াত গুলিতে সে বর্ণনা করা হয়েছে। (২) আবার এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে মানুষের আধ্যাত্মিক জগতেও পরিবর্তন সাধিত হবে। যদিও তা এই ইন্দ্রিয়গাহ্য পৃথিবীতেই শুরু হয়ে যায়। মানুষের পাপ ও পূণ্যের অনুভূতি মানুষ এই পৃথিবীতেই

অনুভব করতে শুরু করে যা তার কর্মের মাধ্যমে তার চরিত্রে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে এই অধ্যাত্মিক অনুভুতিকে শুধুমাত্র প্রতীকের সাহায্যেই প্রকাশ করা সম্ভব ।

৪৯। সেদিন তুমি পাপীদের দেখবে শৃঙ্খলে এক সাথে বাঁধা ১৯২৬।

১৯২৬ : দেখুন [৩৬:৮], [৬৯: ৩০] আয়াত সমূহ। শৃংখলিত অবস্থা হচেছ আত্মার এক বিশেষ অবস্থা- মানুষের মন্দ কাজ, মন্দ চিন্তা, মন্দ উদ্দেশ্য যা তারা ঝেড়ে ফেলতে পারবে না । শৃংখলের মত তা তাদের বেঁধে রাখবে। কিন্তু পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় অনুতাপ এবং সংশোধনের মাধ্যমে তারা তা থেকে মুক্ত হতে পারতো।

৫০। তাদের পোষাক ১৯২৭ হবে তরল আলকাতরার ১৯২৮, এবং তাদের মুখমন্ডল আবৃত্ত থাকবে আগুনে।

১৯২৭ : Sirbal বহুবচনে Sarabil অর্থ পোষাক বা বর্ণ বা জামা বা বুক ঢাকে এমন পাত যা শরীরের প্রধান অংশ ঢাকে যেমনঃ সার্ট কুর্তা ইত্যাদি।

১৯২৮: 'Qatiran' অর্থ আলকাতরা, পাইন জাতীয় বৃক্ষ থেকে নির্গত একরকম আঠালো পদার্থ, অথবা কয়লা পাতন দ্বারা যে আঠালো কালো পদার্থ পাওয়া যায়। এই পদার্থে খুব সহজেই আগুন ধরে যায়। পাপীদের বাইরের আবরণ থেকে খুব সহজেই আগুন তাদের মুখকে আবৃত করবে। মুখ হচেছ শরীরের সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল অংশ মানুষের সত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ । সম্পূর্ণ আয়াতগুলি উপমায় সমৃদ্ধ । মানুষের আত্মার যন্ত্রণার বহিঃ প্রকাশ করা হয়েছে উপমার সাহায্যে ।

এখানে শৃংখল শব্দটি [দেখুন টিকা ১৯২৬] উপমা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই আয়াতে আলকাতরাকে উপমা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই আয়াতে আলকাতরা যেমন কালো এবং খুব সহজেই আগুন ধরে যায়, সেইরূপ পাপী লোকের আত্মা অন্ধকারাছন্ন কালো হয়ে যাবে এবং আত্মার মাঝে যন্ত্রণা অণুভব করবে যা আগুনের যন্ত্রণার মত ভয়াবহ হবে।

৫১। ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ যেন প্রতিটি আত্মাকে তার উপযুক্ত কর্মফল পরিশোধ করতে পারেন ১৯২৯ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।১৯৩০

১৯২৯: "কর্মফল" অর্থাৎ যে যেরূপ কাজ করে তার প্রতিফল । পৃথিবীর জীবন পরকালের শিক্ষানবীশ কাল মাত্র । এই জীবনের ভালো কাজ ও মন্দ কাজের দ্বারা আমাদের পরকালের হিসাব

নির্ধারিত হবে।

১৯৩০: " হিসাব গ্রহণে দ্রুত" অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনে বিচার সম্পন্ন হবে অত্যন্ত দ্রুত । এত দ্রুত মনে হবে যেন সকল কর্মকান্ড চোখের পলকে সম্পন্ন হয়েছে। এই লাইনটির মর্মার্থ দ্বিবিধ (১) পাপীরা যেনো মনে না করে যে, আল্লাহর অসীম করুনায় তারা রক্ষা পেয়ে যাবে এবং তাদের কৃত পাপের প্রতিফল ধীরে ধীরে আসবে। আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন শেষ বিচারের দিন আগত হবে। পাপীদের বিচারের সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে চোখের পলকে । বহু বস্তু দ্বারা আবৃত লোহার কণা যেরূপ চুম্বুকের উপস্থিতিতে চোখের পলকের মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে যায় এবং পৃথক হয়ে পড়ে, ঠিক, সেরূপ পাপাত্মারা মুহূর্তের মধ্যেই সনাক্ত হবে এবং স্ব কর্মের প্রতিফল লাভ করবে। সম্পূর্ণ পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটবে যে, পাপাত্মারা আশ্চর্য হয়ে যাবে ও তারা সাময়িক নিবৃত্তি চাইবে [১৪:৪৪] (২)কেহ যেনো মনে না করে যে, সেই মহাবিচারের দিনে পৃথিবীর মত বিচার সম্পন্ন হতে বহু সময় প্রয়োজন হবে। যদিও সেদিন কোটি কোটি আত্মারা বিচারের জন্য সমবেত হবে। কিন্তু বিচারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে মুহূর্তের মধ্যে চোখের পলকে । কারণ নতুন পৃথিবী হবে ভিন্ন মাত্রার পৃথিবী যা আমাদের ত্রিমাত্রিক ধারণার মানুষ কল্পনাও করতে পারি না । দেখুন আয়াত [১৪: ৪৮] ও টিকা ১৯২৫। সেখানে এই পৃথিবীর থেকে সময়ের ধারণা হবে অন্যরকম । যদি আমরা পৃথিবীর ধারণা অনুযায়ী রোজকেয়ামতের দিনে যে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হবে তার সময়ের ধারণা করি তবে তা মনে হবে চোখের পলকের সমান [দেখুন] আয়াত [১৬: ৭৭] সম্পূর্ণ পরিবর্তন হবে এত দ্রুত ।

৫২। ইহা মানব জাতির জন্য এক [সতর্ক] বাণী । এর দ্বারা তারা সাবধান হোক এবং তারা অবগত হোক যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, ১৯৩১। যারা অনুধাবন করতে পারে তারা মনোযোগী হোক।

১৯৩১: এই আয়াতে আল্লাহর একত্বকে অনুধাবন করতে বলা হয়েছে। বিশ্বভুবনের সৃষ্টিতে, আকাশে, বাতাসে সর্বত্র তাঁর হাতের স্বাক্ষর বর্তমান। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তার বিচার ন্যায় এবং সকলের জন্য তা সমভাবে প্রযোজ্য। তার করুণা ও দয়া সকলের জন্য সমান, যেমন সত্য সকলের জন্য এক। পৃথিবীর নানা বৈচিত্র্য ঘাত, প্রতিঘাত, কামনা, বাসনা আমাদের চিত্তকে করে আন্দোলিত, করে বিক্ষুব্ধ, আবার ক্ষতবিক্ষত । বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ সত্যের প্রকৃত রূপকে করে বিকৃত। যদি আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জগতকে এসবের উর্দ্ধে স্থাপন করতে পারি, তবে খুব সহজেই আমরা কৃত্রিম আরোপিত বাহ্য ব্যাপার সংক্রান্ত দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে মুক্ত হতে পারবো । তখনই আমাদের অন্তরে আল্লাহর একত্বের ধারণা ভাস্বর হয়ে উঠবে। কৃত্রিম ধ্যান ধারণা মূল্যবোধকে বর্জন করার মাধ্যমেই প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভ করা যায়। প্রকৃত সত্য হচেছ

আল্লাহর একত্ববাদ। তারাই ধন্য যারা পৃথিবীর শিক্ষানবীশ কালে প্রকৃত সত্যকে, আল্লাহর একত্ববাদকে অন্তরে ধারণ করতে পেরেছে, অনুধাবন করতে পেরেছে। আল্লাহর কর্তৃত্ব, পরাক্রম, দয়া, করুণা যারা অন্তরে অনুধাবন করতে পেরেছেন তারাই ধন্য।